যৌন হয়রানি বন্ধে রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি দরকার সক্রিয় সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা

দেশজুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত মেয়েশিশু, কিশোরী ও নারীদের বিরুদ্ধে উত্ত্যক্তকরণ বা যৌন হয়রানির ঘটনার ব্যাপকতায় আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের ঘটনায় নারীরা অসম্মানিত-অপমানিত ও নির্যাতিত হচ্ছে, এমনকি পতিত হচ্ছে মৃত্যুমুখে। পত্রপত্রিকাগুলো ভরে উঠছে যৌন হয়রানি, হয়রানির কারণে আত্মহত্যায় বাধ্য হওয়া, হয়রানি প্রতিহত করতে গিয়ে শিক্ষক-অভিভাবকদের মৃত্যুবরণ করা, হয়রানিকারীদের গ্রেফতার হওয়া এবং যৌন হয়রানিবিরোধী সরকারি-বেসরকারি নানা কর্মসূচির সংবাদে। পরিস্থিতির ভয়াবহতাদৃষ্টে সরকার ও তার প্রশাসন যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সীমিত পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে, যেমন ৩ জুনকে ইভটিজিং প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা ও উদযাপন এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে আইন সংশোধনের উদ্যোগ। ইতোমধ্যে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়রানিকারীদের তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের জন্য সীমিত পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতও চালু করেছে।

সম্প্রতি হাইকোর্ট কর্তৃক দেয়া সকল ধরনের ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশটি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রায়ে এসএমএস, এমএমএস, ইমেইল, ফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করাকেও অপরাধ হিসাবে গণ্য করে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ তদারকি করতে প্রতি থানায় সেল গঠন করে কমিটিকে প্রতি মাসে একবার জেলা উন্নয়ন কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও রায়ে নির্যাতিত ব্যক্তি ও সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধানে সরকারকে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যতদিন না এ আইন হচ্ছে, ততদিন সংবিধানের ১১১ নম্বর অনুচ্ছেদকে আইন হিসেবে গণ্য করতে বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ মতে, 'আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।'

আমরা দেখছি, নারী আজ গ্রাম-শহর কোথাও নিরাপদ নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, রাস্তাঘাট, যানবাহন ও পরিবারসহ সর্বত্রই তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই প্রেক্ষাপটে মেয়েশিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যেও একটা নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। মেয়েশিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবকরা স্কুল-কলেজে আসা-যাওয়া করেও হয়রানি থেকে রেহাই পাচ্ছেন না, বরং তাদেরও নির্যাতিত বা মৃত্যুমুখে পতিত হতে হচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ সংঘটনের হার অবিলম্বে না কমানো গেলে দেশে নারীশিক্ষার বেগবান ধারাটি বিঘ্নিত হতে পারে। তাছাড়া এটি নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়ন আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সমুদয় কর্মকাণ্ডকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা হয়, যা প্রকারান্তরে সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্যকেই আরো প্রকট করে তুলবে, সনাতনী ভূমিকার বৃত্তে নারীকে আটকে রাখায় নেতিবাচক অবদান রাখবে।

গত ২৮ অক্টোবর ২০১০ পুলিশ সদর দপ্তরের বরাত দিয়ে দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে, গত আগস্ট পর্যন্ত এক বছরে উত্ত্যক্ত করার ঘটনায় সারাদেশে ১৫০টি মামলা হয়েছে, আর সাধারণ ডায়েরি হয়েছে ৩৭৭টি। এসব অপরাধের সাথে জড়িত ১২৬৯ জনের মধ্যে পুলিশ মাত্র ৫২০ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পেরেছে। গ্রেফতারকৃত এসব অপরাধীর বিচার কবে হবে বা আদৌ হবে কি না তা আমরা কেউ জানি না। আইনগত শিথিলতা, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার অবজ্ঞা-অবহেলা, বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, অপরাধীদের রাজনৈতিক প্রশ্রয়দান প্রভৃতি কারণেই এসব ঘটনার প্রতিকারচিত্র এতটা হতাশাব্যঞ্জক বলে আমরা মনে করি।

আমরা চাই, অবিলম্বে সরকার ও তার প্রশাসন যৌন হয়রানির ঘটনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এর প্রতিকারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হাইকোর্টের নির্দেশনাকে অক্ষরে অক্ষরে পালনের উদ্যোগ নেবে। আর কোনো মেয়েশিশু, কিশোরী বা নারী যাতে যৌন হয়রানির শিকার হতে না পারে, সেজন্য নাগরিক হিসেবে আমাদেরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি সক্রিয় সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এ সমস্যা থেকে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হওয়া হয়ত কখনোই সম্ভব হবে না। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামকে জেন্ডার সংবেদনশীল করা, গণমাধ্যমে যৌন হয়রানির আওতা ও শাস্তি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, স্কুল-কলেজসহ সারাদেশে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বেগবান করা এবং মাদকের বিস্তার রোধসংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ দীর্ঘমেয়াদে এক্ষেত্রে কার্যকর সুফল দিতে পারে বলে মনে হয়।

জানুয়ারি ২০১১